তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বনূ আসাদ প্রমুখ গোত্রের কতক) মরুবাসী (আপনার কাছে এসে ঈমানের দাবী করে। এ ব্যাপারে তারা কয়েকটি গোনাহ্ করে। এক. মিথ্যা ভাষণ ; কারণ,আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতিরেকেই কেবল মুখে) বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা ঈমান আননি (কেননা, ঈমান আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, তা তোমাদের মধ্যে নেই, যেমন وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ বাক্যে বলা হবে) বরং বল, (আমরা বিরোধিতা ত্যাগ করে) বশ্যতা স্বীকার করেছি। (এই বশ্যতা স্বীকার অর্থাৎ বিরোধিতা পরিত্যাগ শুধু বাহ্যিক আনুকূল্যের মাধ্যমেও হয়ে যায়)। এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (কাজেই ঈমানের দাবী করো না। যদিও এ পর্যন্ত ঈমান আননি, কিন্তু এখনও) যদি আল্লাহ্ ও রসূলের (সকল বিষয়ে) আনুগত্য স্বীকার কর (এবং আন্তরিকভাবে ঈমান আন) তবে তোমাদের (ঈমান পরবর্তী) কর্ম (শুধু অতীত কুফরের কারণে) বিন্দুমাত্র লাঘব করা হবে না (বরং পুরোপরি সওয়াব দেওয়া হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু। (এখন শোন, কামিল মু'মিনকে, যাতে তোমরা মু'মিন হতে চাইলে তদ্রূপ হও) তারাই পুরোপরি মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর (তা সারা জীবন অব্যাহত রাখে, অর্থাৎ কখনও) সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা সংগ্রাম করে। (জিহাদ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত)। তারাই সত্যনিষ্ঠ (অর্থাৎ পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠ। শুধু ঈমান থাকলেও সত্যনিষ্ঠ হতো। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছুই নেই ; অথচ তোমরা দাবী করছ পূর্ণ ঈমানের। সুতরাং তাদের এক মন্দ কর্ম তো হচ্ছে মিথ্যা ভাষণ, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا ---- وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এবং দ্বিতীয় মন্দ কর্ম এই যে, তারা ধোঁকা দেয় ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ অতএব) আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কি তোমাদের ধর্ম (গ্রহণ করা) সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করছ ? (অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ করনি। এসত্ত্বেও যে, তোমরা ধর্ম গ্রহণ করার দাবী করছ, এতে জরুরী হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র জ্ঞানের বিপরীতে তোমরা আল্লাহ্কে একথা বলে যাচ্ছ) অথচ (এটা অসম্ভব ; কেননা,) আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে এবং (এছাড়াও) আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (এ থেকে জানা যায় যে, তোমাদের ঈমান না আনার ব্যাপারে আল্লাহ্র জ্ঞানই নির্ভুল। তাদের তৃতীয় মন্দ কর্ম এই যে,) তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে (এটা চরম ধৃষ্টতা। ভাবখানা যেন এই যে, দেখুন আমরা নির্বিবাদে মুসলমান হয়ে গেছি। আর অন্যরা অনেক পেরেশান করে মুসলমান হয়েছে)। আপনি বলে দিন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ

মনে করো না। (কেননা, ধৃষ্টতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলমান হওয়াতে আমার কি উপকার হয়েছে এবং মুসলমান না হওয়াতে আমার কি ক্ষতি? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদেরই পরকালের উপকার এবং মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরই ইহকালের উপকার আছে অর্থাৎ তোমরা হত্যা, কারাবাস ইত্যাদি থেকে বেঁচে গেছ। অতএব আমাকে ধন্য করেছ মনে করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা)। বরং আল্লাহ্ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের এই দাবীতে) সত্যবাদী হও। (কেননা, ঈমান একটি বড় নিয়ামত, আল্লাহ্র শিক্ষা ও তওফীক ব্যতীত অর্জিত হয় না। এমন বড় নিয়ামত দান করেছেন, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সুতরাং ধোঁকা ও ধন্য করেছ মনে করা থেকে বিরত হও। মনে রেখো,) আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয় জানেন। (এই ব্যাপক জ্ঞানের কারণে) তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তাও জানেন। (এই জ্ঞান অনুযায়ী, তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। অতএব তাঁর সামনে মিথ্যা বলার ফায়দা কি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহিযগারী। এই পরহিযগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেকে মু'মিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সা)-এর হক অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল ঃ ইমাম বগভী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আয়াত অবতরণের ঘটনা এই যে, বনূ আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মু'মিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনার পথে ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একে তো ঈমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত তাঁকে ধোঁকা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল ঃ অন্যান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেওয়া দরকার। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানদের সদকা-খয়রাত দ্বারা নিজেদের দারিদ্র্য দূর করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই খাঁটি মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নয়—স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য

আয়াতসমূহ নাযিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا----তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ঈমান না থাকা এবং ঈমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে ঃ তোমাদের 'ঈমান এনেছি' বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর اسلمنا 'ইসলাম কবূল করেছি' বলতে পার। কেননা, ইসলামর শাব্দিক অর্থ বাহ্যিক কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ঈমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব আভিধানিক অর্থে اسلمنا বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি ঃ উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে---পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব ও রসূলের রিসালতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালিমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্তব্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে 'নিফাক' তথা মুনাফিকী। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ঈমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ইসলাম ব্যতীত ধর্তব্য নয় এবং ইসলাম ঈমান ব্যতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে---মু'মিন হবে না এবং মু'মিন হবে---মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে---মু'মিন হবে না ; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ঈমান না থাকার কারণে তারা মু'মিন ছিল না

سورة ق

সূরা কাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫, আয়াত ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ
وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ
فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا
وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا
رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا
بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠
رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ
لُوْطٍ ۝١٣ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۭ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۭ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) সম্মানিত কোরআনের শপথ ; (২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছে দেখে বিস্ময় বোধ করে। অতঃপর কাফিররা বলে ঃ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার ! (৩) আমরা মরে গেলে এবং মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি পুনরুত্থিত হব ? এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। (৪) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (৫) বরং তাদের কাছে সত্য আগমন করার পর তারা তাকে মিথ্যা বলছে। ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৬) তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না---আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি ? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (৭) আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, (৮) প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্য জ্ঞান ও স্মরণিকাস্বরূপ। (৯) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয় (১০) এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, (১১) বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত দেশকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা এবং সামূদ সম্প্রদায়, (১৩) আদ, ফিরাউন ও লূতের সম্প্রদায়, (১৪) বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ক্বাফ্ (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। সম্মানিত কোরআনের শপথ (অর্থাৎ অন্যান্য কিতাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে কিয়ামতের ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি , কিন্তু তারা মানে না ;) বরং তারা এ বিষয়ে বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে) একজন ভয় প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) আগমন করেছেন, (যিনি তাদেরকে কিয়ামতের ভয় প্রদর্শন করেন)। অতঃপর কাফিররা বলে ঃ (প্রথমত) এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার (যে, মানুষ পয়গম্বর হবে, দ্বিতীয়ত সে এক অদ্ভুত বিষয়ের দাবী করবে যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব)। আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হব, এরপরও কি পুনরুত্থিত হব ? এই পুনরুত্থান সুদূরপরাহত। (মোটকথা এই যে, প্রথমত সে আমাদের মতই মানুষ। পয়গম্বরীর দাবী করার অধিকার তার নেই। দ্বিতীয়ত সে একটি অসম্ভব বিষয়ের দাবী করে অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পরও মাটি হয়ে যাওয়ার পর পুনরুত্থিত হব। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত করে তাদের উক্তি খণ্ডন করছেন। এর সার-সংক্ষেপ এই যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার দু'টি কারণ হতে পারে। এক. যেসব বিষয়ের পুনরুত্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর পুনরুত্থানের যোগ্যতাই না থাকা। এটা প্রত্যক্ষভাবে

ভ্রান্ত। কেননা, সেগুলো বর্তমানে তোমাদের সামনে জীবিত উপস্থিত আছে। জীবিত হওয়ার যোগ্যতাই না থাকলে বর্তমানে কিরূপে জীবিত আছে? দুই. আল্লাহ্ তা'আলার পুনরায় জীবিত করার শক্তি না থাকা, এ কারণে যে, মৃতের যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলো কোথায় কোথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার জ্ঞানের অবস্থা এই যে,) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস করে, তা আমার জানা আছে এবং (আজ থেকেই জানি না; বরং আমার জ্ঞান চিরকালের। এমনকি, ঘটনার পূর্বেই সব বস্তুর সব অবস্থা আমি আমার চিরাগত জ্ঞানের সাহায্যে এক কিতাবে অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযে' লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলাম এবং এখন পর্যন্ত) আমার কাছে (সেই) কিতাব (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুয) সংরক্ষিত আছে। তাতে এসব বিক্ষিপ্ত অংশের স্থান, রক্ষণ, পরিমাণ ও গুণ সবকিছু আছে। চিরাগত জ্ঞান কেউ বুঝতে না পারলে তার এরূপ বুঝে নেওয়া উচিত যে, যে দফতরে সবকিছু আছে, তা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত। কিন্তু তারা এরপর অহেতুক বিস্ময় বোধ করে; শুধু বিস্ময়ই নয়) বরং সত্য কথা নবুওয়ত ও পরকালে পুনরুত্থান ও) যখন তাদের কাছে পৌঁছে তখন তাকে মিথ্যা বলে। তারা এক দোদুল্যমান অবস্থায় পতিত আছে (কখনও বিস্ময় বোধ করে, কখনও মিথ্যা বলে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। এরপর কুদরত বর্ণিত হচ্ছে ঃ) তারা কি (আমার কুদরতের কথা জানে না এবং তারা কি) উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না? আমি কিভাবে তা (সমুন্নত ও বৃহৎ) নির্মাণ করেছি এবং (তারকা দ্বারা) সুশোভিত করেছি, তাতে (মজবুতির কারণে) ফাটলও নেই (যেমন অধিকাংশ নির্মাণকাজে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর ফাটল দেখা দেয়। আমার এই কুদরত আকাশে)। ভূমিকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জ্ঞান ও বোঝার উপায় (অর্থাৎ এমন বান্দার জন্য, যে সৃষ্ট জগতকে এভাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে? এ থেকেও আমার কুদরত প্রকাশমান যে,) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্দ্বারা আমি বাগান ও শস্যরাজি উদগত করি এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত দেশকে জীবিত করি। এমনিভাবে (বুঝে নাও যে,) মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। (কেননা, আল্লাহ্র সত্তাগত কুদরতের সামনে সবকিছুই সমান; বরং যে সত্তা বৃহৎ বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, সে যে ক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো সৃষ্টি করা একটি মৃতকে পুনরুজ্জীবন দান করার চাইতে অনেক বড় কাজ। আল্লাহ্ বলেন ঃ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ অতএব এসব বড় বড় কাজ করতে যিনি সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না কেন? কাজেই জানা গেল মৃতকে জীবিত করা অসম্ভব নয়---সম্ভবপর এবং জীবিতকারী আল্লাহ্র কুদরত অপার। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ অথবা প্রত্যাখ্যান করার কি কারণ থাকতে পারে। অতঃপর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য অতীত সম্প্রদায়ের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যেমন কিয়ামত অস্বীকার করে রসূলকে মিথ্যাবাদী

বলে, তেমনি) তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কূপবাসীরা, সামূদ ও আদ সম্প্রদায়, ফিরাউন, লূতের সম্প্রদায়, বনবাসীরা এবং তুব্বা সম্প্রদায়; (অর্থাৎ) প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণকে (অর্থাৎ নিজ নিজ পয়গম্বরকে তওহীদ, রিসালত ও কিয়ামতের ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী বলেছে, অতঃপর আমার শাস্তির যোগ্য হয়েছে। (তাদের সবার উপর আযাব এসেছে। এমনিভাবে এদের উপরও আযাব আসবে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে। সতর্ক করার পর আবার পূর্বের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভংগিতে বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) আমি কি প্রথম-বার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি (যে পুনর্বার জীবিত করতে পারব না। অর্থাৎ একটা সাময়িক বাধা এরূপও হতে পারত যে, কর্মী-ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে কাজ করতে সক্ষম নয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের দোষ ত্রুটি থেকেও পবিত্র। তাঁর উপর কোন কিছুর প্রভাব পড়ে না এবং ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেল। যারা কিয়ামত অস্বীকার করছে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই)। বরং তারা নতুন ভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে (প্রমাণ ছাড়াই) সন্দেহ পোষণ করছে, (যা প্রমাণাদির আলোকে ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়)।

সূরা ক্বাফের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বস্তু উল্লেখ ছিল। এটাই সূরাদ্বয়ের যোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্র-বারে জুম'আর খোতবায় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।—(মুসলিম-কুরতুবী)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেনঃ اِقْتَرَبَتِ এবং ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। —(সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামায হাল্কা মনে হত।—(কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম নামাযও মুসল্লীদের কাছে হাল্কা মনে হত।

আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় কি? اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ —বাক্য থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু একথাই সুবিদিত যে, উপরে যে নীলাভ

রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা শূন্যমণ্ডলের রঙ। কিন্তু আকাশের রঙও যে তাই হবে—একথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে نظر শব্দের অর্থ চর্মচক্ষে দেখা না হয়ে অন্তর চক্ষে দেখা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করাও হতে পারে। —(বয়ানুল-কোরআন)

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কিত একটি বহুল উত্থাপিত প্রশ্নের জওয়াব :

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের সর্ববৃহৎ প্রমাণ এই বিস্ময় যে, মৃত্যুর পর মানুষের দেহের অধিকাংশ অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে দিকবিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পানি ও বায়ু মানবদেহের প্রতিটি কণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দান করার জন্য এই বিক্ষিপ্ত কণাসমূহের অবস্থানস্থল জানা এবং প্রত্যেকটি কণাকে আলাদাভাবে একত্র করার সাধ্য কার আছে? কোরআন পাকের ভাষায় এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সসীম জ্ঞানের মাপকাঠিতে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞানকে পরিমাপ করার কারণেই এই পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান এতই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃত্তিকা গ্রাস করেছে। মানবদেহের কিছু অস্থি আল্লাহ্ তা'আলা এমন তৈরী করেছেন যে, এগুলোকে মৃত্তিকা গ্রাস করতে পারে না। অবশিষ্ট যেসব অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়, সেগুলো সবই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবগুলোকে এক জায়গায় একত্র করবেন। সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তাতেও সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উপাদান সন্নিবেশিত রয়েছে; কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ঔষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পুনর্বার এসব উপাদানকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্র করা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মানবদেহের এসব উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'লওহে-মাহফূযে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহরে-মুহীত)

فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ—অভিধানে مريج শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার

বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণত ফাসিদ ও দূষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) مَرِيْجٍ শব্দের অনুবাদ করেছেন ফাসিদ ও দুষ্ট। যাহ্হাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (র) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসূলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতিন্দ্রিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্ কথার জওয়াব দেওয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ—فُرُوْج শব্দটি فَرْج-এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের রিসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য মর্মপীড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফিররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বারবার বর্ণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর পর্যন্ত তাদের হিদায়তের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

أَصْحَابُ الرَّسِّ কারা? ঃ رس শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কূপকে رس বলা হয়। أَصْحَابُ الرَّسِّ বলে আযাবের পর সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরকারের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান

ত্যাগ করে হাযরামাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্ (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্ (আ) মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حضر موت (হাযারা-মাউত অর্থাৎ মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লিখিত হয়েছে ঃ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

ثمود — হযরত সালেহ (আ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

عاد — বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হূদ (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝন্‌ঝার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

اخوان لوط — হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

اصحاب الايكة — ঘন জঙ্গল ও বনকে ايكة বলা হয়। তারা এরূপ জায়-গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

قوم تبع — ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুব্বা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ
اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾
وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾
وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا

سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ
عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ
الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ
بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

(১৬) আমি মানব সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে; তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সূতীক্ষ্ণ। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (২৯) আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে কিয়ামতের দিন মৃতদের জীবিত হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে। বাস্তবতা পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপর নির্ভরশীল। তাই

প্রথমে এ কথাই বলা হচ্ছে ঃ) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। (এটা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ) তার মনে যেসব কুচিন্তা জাগরিত হয়, আমি তা- (ও) জানি। (অতএব যেসব ক্রিয়াকর্ম তার হস্ত, পদ ও জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত হয়, তা আরও উত্তমরূপে জানি ; বরং আমি তার হাল অবস্থা এত জানি যে, যা সে নিজেও জানে না। সুতরাং জানার দিক দিয়ে) আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। (এই ধমনী কর্তন করা হলে মানুষ মারা যায়। মানুষের সাধারণ অভ্যাসে জানোয়ারের আত্মা বের করার জন্য গ্রীবা কর্তনেরই পদ্ধতি প্রচলিত আছে ; তাই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতে কলিজা থেকে উদ্ভূত এবং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত —উভয় প্রকার ধমনী বোঝানো যেতে পারে। তবে হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনী বোঝানোই অধিক সঙ্গত। কেননা, এই প্রকার ধমনীতে আত্মা সতেজ ও রক্ত নিস্তেজ থাকে। কলিজা থেকে উদ্ভূত ধমনীর অবস্থা এর বিপরীত। যার মধ্যে আত্মার প্রভাব বেশী, এখানে সেই ধমনী বোঝানোই উপযুক্ত। সূরা হাক্কায় হৃৎপিণ্ডের ধমনী অর্থে وتين শব্দের ব্যবহার এর সমর্থন করে। আলোচ্য আয়াতে ورید শব্দ ব্যবহৃত হলেও এর আভিধানিক অর্থের মধ্যে উভয় প্রকার ধমনী দাখিল আছে। সুতরাং উদ্দেশ্য এই যে, আমি জানার দিক দিয়ে তার আত্মা ও মনের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ মানুষ নিজের হাল-অবস্থা যেমন জানে, আমি তার হাল-অবস্থা তার চাইতেও বেশী জানি। সেমতে মানুষ তার অনেক অবস্থা জানে না। যা জানে, তা-ও অনেক সময় ভুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় এর অবকাশ নেই। যে জ্ঞান সর্বাবস্থায় হয়, তা এক অবস্থার জ্ঞানের চাইতে নিশ্চিতই বেশী হবে। সুতরাং আল্লাহ্র জ্ঞান যে মানুষের সব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। অতঃপর একে আরও জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থা কেবল আল্লাহ্র জ্ঞানেই সংরক্ষিত নয় ; বরং বাহ্যিক তর্কের মুখ বন্ধ করার জন্য সেইসব ক্রিয়াকর্ম ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েও সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ) যখন দুইজন গ্রহণকারী ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে (মানুষের ক্রিয়াকর্ম) গ্রহণ করে (এবং প্রত্যেক আমল লিপিবদ্ধ করে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ আরও বলেন ঃ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ — মানুষের مَا تَمْكُرُونَ

সব কাজকর্মের মধ্যে কথাবার্তা সর্বাধিক হালকা। কিন্তু এর অবস্থা এই যে) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছেই সদাপ্রস্তুত প্রহরী আছে। (নেক কথা হলে ডান দিকের ফেরেশতা এবং অসৎ কথা হলে বাম দিকের ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করে। মুখে উচ্চারিত এক একটি বাক্যই যখন সংরক্ষিত ও লিখিত আছে, তখন অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম সংরক্ষিত হবে না কেন ? পরকালীন জীবন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শাস্তির ভূমিকা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা, মৃত্যু থেকে উদাসীনতার ফলস্বরূপ কিয়ামত অস্বীকার করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে—হুঁশিয়ার হয়ে যাও)। মৃত্যু-যন্ত্রণা নিশ্চিতই (নিকটে) এসে গেছে (অর্থাৎ প্রত্যেকের মৃত্যু নিকটবর্তী)।

এ থেকেই টালবাহানা (ও পলায়ন) করতে (মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি সৎ-অসৎ সবার মধ্যে একই রূপ বিদ্যমান। কাফির ও পাপাচারী ব্যক্তির সংসারাসক্তির কারণে মৃত্যু থেকে পলায়ন আরও সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহাতিশয্যে কোন বিশেষ বান্দার কাছে যদি মৃত্যু আনন্দদায়ক ও কাম্য হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের উর্ধ্বে। এই ভূমিকা অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনার পর এখন আসল উদ্দেশ্য কিয়ামতের বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পুনর্বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে (এতে সবাই জীবিত হয়ে যাবে)। এটা হবে শাস্তির দিন। (মানুষকে এর ভয় প্রদর্শন করা হত। অতপর কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে) প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে (কিয়ামতের ময়দানে) আগমন করবে যে, তার সাথে (দু'জন ফেরেশতা) থাকবে (তাদের একজন) চালক ও (অপরজন তার ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষী। [এক হাদীসে আছে এই চালক ও সাক্ষী সেই ফেরেশতাদ্বয়ই হবে, যারা জীবদ্দশায় মানুষের ডানে ও বামে বসে ক্রিয়া-কর্ম লিপিবদ্ধ করত। (দুররে মনসূর) যদি এই হাদীস হাদীসবিদদের শর্তানুযায়ী গ্রহণ-যোগ্য না হয়, তবে অন্য দু'জন ফেরেশতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন কেউ কেউ একথা বলেন। তারা কিয়ামতের ময়দানে পৌঁছার পর তাদের মধ্যে যে কাফির হবে, তাকে বলা হবে ঃ] তুমি তো এই দিন সম্পর্কে বেখবর ছিলে (অর্থাৎ একে স্বীকার করতে না) এখন আমি তোমার সম্মুখ থেকে (অস্বীকার ও উদাসীনতার) যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (এবং কিয়ামত চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছি)। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। (অনুভূতির পথে কোন বাধা নেই। দুনিয়াতেও যদি তুমি বাধা অপসারণ করে দিতে, তবে আজ তোমার সুদিন হত। অতঃপর) তার সঙ্গী (কর্ম লিপিবদ্ধকারী) ফেরেশতা [আমলনামা উপস্থিত করে বলবে ঃ আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই---(দুররে মনসূর) সেমতে আমল-নামা অনুযায়ী কাফিরদের সম্পর্কে উপরোক্ত দু'জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হবে ঃ] তোমরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর, যে কুফর করে, (সত্যের প্রতি) ঔদ্ধত্য পোষণ করে, সৎ কাজে বাধাদান করে এবং (দাসত্বের) সীমালংঘন করে ও (ধর্মের ব্যাপারে) সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (কাফিররা যখন জানতে পারবে যে, এখন তারা চিরস্থায়ী দুর্ভোগে পতিত হবে, তখন আত্মরক্ষার্থে তারা পথভ্রষ্টকারীদেরকে অভিযোগ করে বলবে ঃ আমাদের কোন দোষ নেই। আমাদেরকে অন্যরা পথভ্রষ্ট করেছে। যেহেতু শয়তান পথ-ভ্রষ্টকারীদের মধ্যে দাখিল ছিল, তাই বলা হয়েছে ঃ) তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করিনি (যেমন তার অভিযোগ থেকে বোঝা যায়) কিন্তু (আসল ব্যাপার এই যে) সে নিজেই (স্বেচ্ছায়) সুদূর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল (আমিও অপহরণ করেছি, কিন্তু এতে জোর-জবর ছিল না। তাই তার পথভ্রষ্টতার প্রভাব আমার উপর পতিত হওয়া উচিত নয়)। ইরশাদ হবে ঃ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না (এটা নিষ্ফল)। আমি তো পূর্বেই তোমাদের কাছে শাস্তির খবর প্রেরণ করেছিলাম (যে, যে ব্যক্তি কুফর করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় এবং যে কুফরের আদেশ করবে স্বেচ্ছায় অথবা অপরের উস্কানিতে, তাদের সবাইকে আমি স্তরের পার্থক্যসহ জাহান্নামের শাস্তি দেব। অতএব) আমার কাছে (উপরোক্ত শাস্তির বিধান)

রদবদল হবে না (বরং তোমরা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে) এবং আমি (এ ব্যাপারে) বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (বরং বান্দারা নিজেরাই এমন অপকর্ম করে আজ তার শাস্তি ভোগ করছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তি বহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে ? কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্র করে দেওয়া আমার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ্র জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃতে জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থায় জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধমনীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

আল্লাহ্ গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী—একথার তাৎপর্য ঃ

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় وريد শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক. যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌঁছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই وريد বলা হয়। দুই. যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রূহ্ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী وريد শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেওয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে وريد বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এ স্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লিখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেওয়া

হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী অর্থাৎ তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুযুর্গগণের মতে আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সংলগ্নতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সিজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বলেছিলেনঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেনঃ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সিজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ্ বলেনঃ আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্ম ফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট। এরূপ মু'মিন 'আল্লাহ্র ওলী' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের প্রাণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। মওলানা রূমী (র) তাই বলেনঃ

اتصالے بے مثال و بے قیاس - ہست رب الناس را با جان ناس

অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, যার কোন স্বরূপ বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকট্য ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে আয়াতে نَحْنُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার

সত্তা বোঝানো হয়নি ; বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ

تَلَقِّى— শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া। فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ নিয়ে নিলেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে مُتَلَقِّيَانِ বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদা সর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ তাদের একজন ডানদিকে থাকে এবং সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। قَعِيْدٌ শব্দটি قاعد (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। قَعِيْدٌ এর অর্থ قاعد হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, قاعد শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قعيد শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে قعيد বলা হয়---উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের অবস্থাও তাই। তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে---সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদ্বয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ্ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাফ ইবনে কায়স (র)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ এই ফেরেশতাদ্বয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম-দিকের ফেরেশতারও দেখাশুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।---(ইবনে আবী হাতেম)

আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা ঃ হযরত হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ

হে আদম সন্তানগণ! তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বামদিকে। ডান দিকের ফেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবদ্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশী কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ـ اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, আমলনামা কোন পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে খট্কা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্তু যার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেন ঃ এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা)-র এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের

বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে ঃ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ -এর অর্থ তাই।

ইমাম আহমদ (র) হযরত বিলাল ইবনে হারিস মুযনী (রা) থেকে যে রিওয়ায়েত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাল কথা বলে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কোন বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গোনাহ্ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আলকামাহ্ (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ এই হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। ---(ইবনে কাসীর)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

মৃত্যু-যন্ত্রণা

سكرة الموت—-এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মূর্ছা যাওয়া। আবূ বকর ইবনে আম্বারী (র) হযরত মসরুক (র) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় ঃ اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر—অর্থাৎ আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বক্ষ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা) শুনে বললেন ঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করেছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ —ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন ঃ لا اله الا الله ان للموت سكرات—অর্থাৎ কালিমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন ঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক।

بِالْحَقِّ—এখানে باء অব্যয়টি تعدية অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই

যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। ---(মাযহারী)

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ—تَحِيْدُ শব্দটি حيد থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বয়ঃ وَجَآءَتْ كُلُّ

نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ—এই আয়াতের পূর্বে কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন سائق থাকবে। سائق সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شهيد-এর অর্থ সাক্ষী। سائق যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। شهيد-সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কারও কারও মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

شهيد সম্পর্কে কেউ বলেনঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষকেই شهيد বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত নাঃ

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ—অর্থাৎ আমি তোমাদের

সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইবনে জরীর (র), ইবনে কাসীর প্রমুখের মতে মু'মিন, কাফির, মুত্তাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম্ হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন ঃ النَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا—অর্থাৎ আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ—এখানে সঙ্গী অর্থ সেই ফেরেশতা যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِق তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে شَهِيْد তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌঁছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরয করবে ঃ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ অর্থাৎ তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন ঃ এখানে قَرِيْن শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

اَلْقِيَا—اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যত পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে-কাসীর)

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ—قَرِين শব্দের আসল অর্থ যে সঙ্গে থাকে এবং মিলিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আসল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে যেমন মানুষের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে আহবান করে। আলোচ্য আয়াতে قرين বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে ঃ পরওয়ারদিগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহ্যত বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ—অর্থাৎ আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওযরের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ—আমার কথা রদবদল হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইন-সাফের ফয়সালা করেছি।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ
الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾
مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

(৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' সে বলবে, 'আরও আছে কি?' (৩১) জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—(৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখান থেকে হাশরের অবশিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে। মানুষকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) সেদিন আমি জাহান্নামকে (কাফিরদের প্রবেশ করার পর) জিজ্ঞাসা করব ঃ তুমি ভরে গেছ কি ? সে বলবে ঃ আরও আছে কি ? [কাফিরদেরকে আরও ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা, যাতে জওয়াব শুনে তাদের অন্তরে দোযখের আতংক আরও বেড়ে যায় যে, আমরা কিরূপ ভয়ংকর ঠিকানায় পৌঁছে গেছি। সে তো সবাইকে গ্রাস করতে চায়। জাহান্নামের তরফ থেকে 'আরও আছে কি' বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সম্ভবত আল্লাহ্‌র দুশমন কাফিরদের প্রতি জাহান্নামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরা মুলকে এই ক্রোধ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ জাহান্নাম জওয়াবে একথা বলেনি যে, তার পেট ভরেনি। সে ক্রোধবশতই আরও চেয়েছে। কাজেই এটা لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ আয়াতের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানব দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাবেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর জাহান্নাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি ? (ইবনে কাসীর) জান্নাতের বর্ণনা এই যে] জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌ভীরুদের অদূরে (এবং আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে বলা হবে ঃ) এরই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক (আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আল্লাহ্‌র কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ) তোমরা এই জান্নাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রার্থিত বস্তু অপেক্ষা) আরও বেশী (নিয়ামত) আছে (যা জান্নাতীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীদার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوَّابٍ কারা ঃ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ—অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٍ ও حَفِيظٍ-এর জন্য রয়েছে। أَوَّابٍ-এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, শা'বী ও মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ্ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই أواب। হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন ঃ أواب এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ্র কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, حفيظ ও أواب এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا اَصَبْتُ مِنْ مَّجْلِسِیْ هٰذَا

আল্লাহ্ পবিত্র এবং তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ্, আমি এই মজলিসে যে গোনাহ্ করেছি, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ حفيظ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। তাঁর কাছ থেকে অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে حفيظ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে, সে حفيظ ও أواب। ---(কুরতুবী)

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ—আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ منيب (বিনীত) এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ্র আদবকে সর্বদা চিন্তায় উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا—অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাবে, তা-ই পাবে। অর্থাৎ চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি---এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।---(ইবনে কাসীর)

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ —অর্থাৎ আমার কাছে এমন নিয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রা) বলেন ঃ এই বাড়তি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত তথা সাক্ষাৎ, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।---(কুরতুবী)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا
فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ
لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾
فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন-স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল এবং (সাংসারিক সাজ-সরঞ্জাম বাড়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ শক্তিশালী হওয়ার পর জীবনোপকরণের

ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত ছিল ; কিন্তু যখন আযাব আসল, তখন) তাদের পলায়নের স্থানও ছিল না। এতে (অর্থাৎ ধ্বংস করার ঘটনায়) তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (সমঝদার) অন্তঃকরণশীল অথবা (সমঝদার না হলে কমপক্ষে) যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (শ্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্যে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র কুদরতকে অক্ষম মনে করে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কারণ, আমার কুদরত এমন যে,) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে) সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শও করেনি। (এমতা-

বস্থায় মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন ? আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ এসব সন্দেহ নিরসনকারী জওয়াব সত্ত্বেও তারা অনবরত অস্বীকারই করে যাচ্ছে) অতএব আপনি সবর করুন (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না। যেহেতু কোনদিকে মনকে নিবিষ্ট করা ব্যতীত দুঃখের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ সকালের নামাযে) এবং সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ যোহর ও আসরের নামাযে) আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রিতেও তাঁর পবিত্রতা (ও প্রশংসা) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে) এবং (ফরয) নামাযের পশ্চাতেও (এতে নফল ও ওজিফা দাখিল হয়ে গেছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকুন, যাতে তাদের কুফরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَقَّبُوا—نَقِّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ শব্দটি تَنْقِيب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাকপদ্ধতিতে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَحِيص -এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা ঃ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে 'কল্‌ব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কল্‌ব

তথা অন্তকরণ। তাই একে কল্‌ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে কল্‌ব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কল্‌বের উপরই হায়াত ভিত্তি-শীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ — **لقاء سمع**-এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং **شهيد** এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত-সমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। এক যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে। দুই. অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ কামিল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরীদগণ দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ — **سبح** শব্দটি **تسبيح** থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আসরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বাচনিক এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

ان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوٰة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها يعنى العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب -

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। এর প্রমাণ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(কুরতুবী)

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।---(মাযহারী)

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ — হযরত মুজাহিদ বলেনঃ **سجود** বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আক্‌বার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ-দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।--(বুখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, أَدْبَارَ السُّجُودِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ
بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا
الْمَصِيرُ ۝ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا
يَسِيرٌ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ
بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۝

---

(৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, মনোযোগ সহকারে) শুন, যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা (অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল শিংগায় ফুঁক দিয়ে মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য) নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ আওয়াজটি নির্বিঘ্নে সবার কানে পৌঁছবে, যেন নিকটতম স্থান থেকেই কেউ আহ্বান করছে।---দূরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌঁছে এবং কারও কানে পৌঁছে না---এরূপ হবে না)। যেদিন মানুষ এই চিৎকার নিশ্চিতরূপে শুনতে পাবে, সেদিনই (কবর থেকে) পুনরুত্থান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমণ্ডল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটাছুটি করবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না মানলে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) জোরজবরকারী নন; (বরং শুধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কোরআনের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিকে) উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও সবাইকে উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও গুটিকতক লোকই আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বোঝা গেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিন্তা কিসের?]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ—অর্থাৎ যেদিন আহ্‌বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্‌বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়--স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন ঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।---(মাযহারী)

আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যদ্দ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা বলেন ঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।---(কুরতুবী)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا—অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আ) সবাইকে আহ্‌বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (র) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদা পূরণকারী, হে দয়াময়।

سورة الذاريات

সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسِّمٰتِ
اَمْرًا ۝٤ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦
وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨ يُّؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ اُفِكَ ۝٩ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١
يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣ ذُوْقُوْا
فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ
جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٥ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُحْسِنِيْنَ ۝١٦ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩ وَفِي الْاَرْضِ
اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝٢٠ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٢١ وَفِي السَّمَآءِ
رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝٢٢ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ
مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝٢٣

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে

(১) কসম ঝন্‌ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদেরকে প্রদত্ত

ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী। (৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) আল্লাহ্‌ভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতি-পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম ঝন্‌ঝাবায়ুর, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের (অর্থাৎ বৃষ্টি) অতঃপর মৃদু-চলমান জলযানের, অতঃপর ফেরেশতাদের, যারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বস্তুসমূহ বন্টন করে (উদাহরণত যেখানে যে পরিমাণ রিযিকের মূল উপাদান বৃষ্টির আদেশ হয়, মেঘমালার সাহায্যে সেখানে সেই পরিমাণ বৃষ্টি পৌঁছে দেয়। এমনিভাবে হাদীসে আছে, জননীর গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নর ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াব বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তোমাদেরকে প্রদত্ত (কিয়ামতের) ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং (কর্মসমূহের) প্রতিদান (ও শাস্তি) অবশ্যম্ভাবী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের বলে এসব আশ্চর্য কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রমাণ। অতএব, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিয়ামত সংঘটিত করা মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বাক্যের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীর দুররে-মনসূরের এক হাদীস দ্বারা পরে বর্ণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বস্তুর কসম খাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেমতে ফেরেশতা ঊর্ধ্বজগতের সৃষ্ট এবং বাতাস ও জলযান অধঃজগতের সৃষ্ট এবং মেঘমালা শূন্য জগতের সৃষ্ট। অধঃজগতের দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি চোখে দৃষ্টিগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরূপ দুটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত সম্পর্কিত এক বিষয়বস্তুতে খোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে; যেমন উপরে ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কিত বস্তুসমূহের ছিল। অর্থাৎ) কসম আকাশের, যাতে (ফেরেশতাদের চলার) পথ আছে; (যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ অতঃপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা (অর্থাৎ সবাই কিয়ামত সম্পর্কে) বিভিন্ন কথাবার্তা বলছ (কেউ সত্য বলে এবং কেউ মিথ্যা

বলে। আল্লাহ্ বলেন ঃ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ —আকাশের কসম দ্বারা সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। কিন্তু যে সত্য বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিয়ামতের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরায়, যে (পুরোপুরিভাবে পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে) বঞ্চিত ঃ (যেমন হাদীসে আছে, من حرمه فقد حرم الخير كله —অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সব পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে সত্য বলে, তাদের অবস্থা এরই মুকাবিলা থেকে জানা যায় যে, তারা পুণ্য ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। অতঃপর বঞ্চিতদের নিন্দা করে বলা হচ্ছে ঃ) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা ধ্বংস হোক, (অর্থাৎ যারা কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই কিয়ামতকে অস্বীকার করে) যারা মূর্খতাবশত উদাসীন। (তারা ঠাট্টা ও ত্বরান্বিত করার ভঙ্গিতে) জিজ্ঞাসা করে ঃ প্রতিফল দিবস কবে হবে? (জওয়াব এই যে, সেদিন হবে) যেদিন তারা অগ্নিদগ্ধ হবে (এবং বলা হবে ঃ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (এই জওয়াবটি এমন, যেমন ধরুন, একজন অপরাধীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ফাঁসির তারিখ না বলার কারণে আদেশ-টিকে কেবল মিথ্যাই মনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ফাঁসি কবে হবে? এই প্রশ্নটি যেহেতু হঠকারিতা প্রসূত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বর্ণিত হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুরা জান্নাতে প্রস্রবণে থাকবে এবং তারা (সানন্দে) গ্রহণ করবে; যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। (কেননা) তারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৎকর্মপরায়ণ ছিল। (সুতরাং هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ এর ওয়াদা অনুযায়ী তাদের সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা (ফরয ও ওয়াজিব পালন করার পর নফল ইবাদতে এতই লিপ্ত থাকত যে) রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত (অর্থাৎ বেশীর ভাগ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেমন কিছু মনে করত না; বরং) রাতের শেষ প্রহরে (নিজেদেরকে ইবাদতে ত্রুটিকারী মনে করে) তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (এ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের অবস্থা)। এবং (আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল [অর্থাৎ এমন নিয়মিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের পাওনা আছে।এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হয়েছে। (দুররে-মনসুর) আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, জান্নাত ও প্রস্রবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল; বরং জান্নাতের উচ্চস্তরের অধিকারীদের

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাফিররা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই অতঃপর এর প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে] বিশ্বাসকারীদের (অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেষ্টাকারীদের) জন্য (কিয়ামতের সম্ভাব্যতা বিষয়ে) পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন (ও প্রমাণ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (রয়েছে ; অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। এসব প্রমাণ যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই শাসানির ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা কি (মতলব) অনুধাবন করবে না ? (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসম্পর্কে কথা এই যে) তোমাদের রিযিক এবং (কিয়ামত সম্পর্কে) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেসব (অর্থাৎ সেসবের নির্দিষ্ট সময়) আকাশে (লওহে মাহ্‌ফূযে) লিপিবদ্ধ আছে। (এর নিশ্চিত জ্ঞান পৃথিবীতে কোন উপযোগিতার কারণে নাযিল করা হয়নি। সেমতে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ আয়াতেও নির্দিষ্ট সময় বলা হয়নি। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বৃষ্টির নির্দিষ্ট দিন কারও জানা থাকে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যখন রিযিক নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তখন নির্দিষ্ট তারিখ জানা না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিরূপে জরুরী হয়ে যায় ? এরূপ প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করার কারণেই مَا تُوعَدُونَ এর সাথে رِزْقُكُمْ-কে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ নেই এবং হওয়ার প্রমাণ আছে, তখন) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, এটা (অর্থাৎ কর্মফল দিবস) সত্য (এবং এমন নিশ্চিত) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। (এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়ামতকেও নিশ্চিত জ্ঞান কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। এক. الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا দুই. الْحَامِلَاتِ وِقْرًا তিন. الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا এবং চার. الْجَارِيَاتِ يُسْرًا—

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা) ও আলী মোর্তাযা (রা)-র উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝন্‌ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বণ্টন করে।---(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসুর)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ -- حبك -- শব্দটি حبكة- এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك-এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই ঃ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ -- বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তি'র' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।---(মাযহারী)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ -- افك-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো।

عنه-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

দুই. এই সর্বনাম দ্বারা قول مختلف (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ -- خراص-এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক

উক্তিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।---(মাযহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মু'মিন ও পরহিযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

يَهْجَعُونَ শব্দটি هُجُوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মু'মিন পরহিযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহিযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামায ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই ঃ আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ, তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশী করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্বীকার করে। আল্লাহ্র রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে এবং না আল্লাহ্র রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায়। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে ঃ

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا —অর্থাৎ যারা ভালমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল ঃ হে আবূ উসামা, আল্লাহ্ তা'আলা পরহিযগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ), আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জওয়াবে বললেন ঃ

طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ—তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করে না।--- (ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না ; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গোনাহ্ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام -

লোক সকল। তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামায পড়, যখন মানুষ নিদ্রা-মগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।---(ইবনে কাসীর)

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ অর্থাৎ মু'মিন পরহিযগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। سحر শব্দটি اسحار—এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না)। তিনি ঘোষণা করেন ঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবূল করব ? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব ?---(ইবনে কাসীর)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহিযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে ?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার অধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ---(মাযহারী)

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ঃ وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ — سائل বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহায্য করে محروم বলে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মু'মিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজখবর নেয়।

বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে ঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ — অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে

কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর মু'মিন পরহিযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর মাযহারীতে একেও মু'মিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং موقنين-এর অর্থ আগের متقين-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ায় হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ — এ স্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ ভূপৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অঙ্গকে আল্লাহ্‌র কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা মানবীয় বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো-বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেযাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فتبارك الله احسن الخالقين

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়---স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্কে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ أفلا تبصرون

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وفي السماء رزقكم وما توعدون---অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে-মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিযিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেষ্টা করে তবে রিযিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিযিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। --(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রিযিক অর্থ বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্য জগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। ما توعدون বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ —অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ
فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ
إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن
طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي
مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ
وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا
تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ
لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ
وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

(২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ সালাম, তখন সে বললঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বললঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বললঃ আমি তো বৃদ্ধা বন্ধ্যা। (৩০) তারা বললঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৩১) ইবরাহীম বললঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমান-দার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? ['সম্মানিত' বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা ছিল। ফেরেশতাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ বলা হয়েছে। অথবা এর কারণ ছিল এই যে, ইবরাহীম (আ) স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে 'মেহমান' বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা মানুষের বেশে আগমন করেছিল। এই বৃত্তান্ত তখনকার ছিল,] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেন ঃ সালাম। (আরও বললেন ঃ) অপরিচিত লোক (মনে হয়। বাহ্যত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। কারণ, এরপর ফেরেশতাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে বলে দেওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনলাম না। আগন্তুক মেহমানরা এর কোন জওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জওয়াবের অপেক্ষা করেন নি। মোটকথা এই সালাম ও কালামের পর) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোটা গোবৎস ভাজা (لقوله تعالى بعجل حنيذ) নিয়ে হাযির হলেন। তিনি গোবৎসটি তাদের সামনে রাখলেন। [তারা ফেরেশতা ছিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর সন্দেহ হল এবং] বললেন ঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (এরপরও যখন আহার করল না, তখন) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শত্রু কিনা, কে জানে; যেমন সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে)। তারা বলল ঃ আপনি ভীত হবেন না। (আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা। একথা বলে) তারা তাঁকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল, যে জ্ঞানীগুণী (অর্থাৎ নবী) হবে। [কেননা, মানবজাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানী হন। এখানে হযরত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে] তাঁর স্ত্রী (হযরত সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, لقوله تعالى وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ সন্তানের সংবাদ শুনে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতারা যখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল —لقوله تعالى فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ—তখন আশ্চর্যান্বিতা হয়ে) মুখ চাপড়িয়ে বললেন ঃ (প্রথমত) আমি বৃদ্ধা (এরপর) বন্ধ্যা। (এমতাবস্থায় সন্তান হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার বটে;) ফেরেশতারা বলল ঃ (আশ্চর্য হবেন না لقوله تعالى أَتَعْجَبِينَ) আপনার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি

প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবে আশ্চর্যের হলেও আপনি নবী-পরিবারের লোক, জ্ঞানে-গুণে ধন্য। আল্লাহ্‌র উক্তি জেনে আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলভ দূরদর্শিতা দ্বারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ কওমে লূতের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করি---যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে (অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে) চিহ্নিত আছে। (সূরা হূদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন ঃ যখন আযাবের সময় ঘনিয়ে এল, তখন) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (এতে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কারণ, যার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না)। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেথায় (চিরকালের জন্য) একটি নিদর্শন রেখেছি এবং মূসা (আ)-র বৃত্তান্তেও নিদর্শন রয়েছে; যখন আমি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মো'জেযা)-সহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পারিষদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় উন্মাদ। অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম)। সে শাস্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর অশুভ বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল (অর্থাৎ ধ্বংসের আদেশপ্রাপ্ত যেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত,) তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ [অর্থাৎ সালেহ্‌ (আ) বলেছিলেন ঃ] কিছুকাল আরাম করে নাও। (অর্থাৎ কুফর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল, এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (অর্থাৎ এই আযাব খোলাখুলিভাবে আগমন করল)। অতএব, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল (বরং উপুড় হয়ে পড়ে রইল لقوله تعالى جاثمين -) এবং না কোন প্রতিকার করতে পারল। ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও এ অবস্থা হয়েছিল। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوا سَلَامًا ــ ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ইবরাহীম (আ) জওয়াবে বললেন سَلَامٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে।

কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُّنكَرُونَ—نكر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্‌কেও منكر বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

رَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ—راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি ঃ ইবনে কাসীর বলেন এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি ; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই যবেহ্ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না ; বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন أَلَا تَأْكُلُونَ—অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ—অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ—صرة-এর অর্থ অসাধারণ আওয়ায। কলসের শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর

গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ عَجُوزٌ عَقِيمٌ অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ كَذٰلِكِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।---(কুরতুবী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্র ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়---মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ---অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আযাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে যখন মূসা (আ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ ফিরাউন মূসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনা-বাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আ)-এর বাক্যে اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ -এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ

الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾
فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ
قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

(৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম! (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছেঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুত তারা দুষ্ট সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মু'মিনদের উপকারে আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আমি ভূমিকে বিছানা (স্বরূপ) করেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (অর্থাৎ এতে কত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রেখেছি। আমি প্রত্যেক বস্তু দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিপরীত পক্ষ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কোন-না-কোন সত্তাগত ও অসত্তাগত গুণ এমন রয়েছে, যা অন্য বস্তুর গুণের বিপরীত। ফলে এক বস্তুকে অপর বস্তুর বিপরীত গণ্য করা হয়; যেমন আকাশ ও পাতাল, উত্তাপ ও শৈত্য, মিষ্ট ও তিক্ত, ছোট ও বড়, সুশ্রী ও কুশ্রী, সাদা ও কাল এবং আলো ও অন্ধকার)। যাতে তোমরা (এসব সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে তওহীদকে) হৃদয়ঙ্গম কর। (হে পয়গম্বর! তাদেরকে বলে দিন, যখন এসব সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার একত্ব বোঝায়, তখন) তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের উচিত, এসব প্রমাণের ভিত্তিতে) আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, (তদুপরি) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্‌র

পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী (যে, তওহীদ অমান্য করলে শাস্তি হবে। কাজেই তওহীদের বিশ্বাস আরও জরুরী। আরও স্পষ্ট করে বলছি ঃ) তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (তওহীদের বিষয়বস্তু শব্দান্তরে বর্ণনার কারণে সতর্ককরণের তাকীদার্থে বলা হচ্ছে ঃ) আমি তোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ আপনি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট সতর্ককারী কিন্তু আপনার বিরোধী পক্ষ এত মূর্খ যে, তারা আপনাকে কখনও যাদুকর, কখনও উন্মাদ বলে। অতঃপর আপনি সবর করুন। কেননা, তারা যেমন আপনাকে বলছে,) এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা (সবাই অথবা কতক) বলেছে ঃ যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মুখে একই কথা উচ্চারিত হওয়ার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ঃ)তারা কি একে অপরকে এ বিষয়ের ওসীয়ত করে এসেছে ? (অর্থাৎ এই ঐকমত্য তো এখন, যেমন একে অপরকে বলে গেছে, দেখ যে রসূলই আগমন করে, তোমরা তাকে আমাদের মতই বলবে। অতঃপর বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, একে অপরকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়ত করেনি। কেননা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সাথে দেখাও করেনি। বরং ঐকমত্যের কারণ এই যে) তারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায় (অর্থাৎ অবাধ্যতায় যখন তারা অভিন্ন, তখন উক্তিও অভিন্ন হয়ে গেছে)। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ তাদের মিথ্যাবাদী বলার পরোয়া করবেন না)। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। বোঝাতে থাকুন কেননা, বোঝানো (যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই, তাদেরকে জব্দ করার কাজে আসবে এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, সেই) ঈমানদারদেরকে (এবং যারা পূর্ব থেকে মু'মিন, তাদেরকেও) উপকার দেবে। (মোট কথা, উপদেশ দানের মধ্যে সবারই উপকার আছে। আপনি উপদেশ দিয়ে যান এবং ঈমান না আনার কারণে দুঃখ করবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ রয়েছে।

بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ — أَيْدٍ শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য।

এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহ্র দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।---(কুরতুবী)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

(৫৬) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনকে সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। (৫৯) অতএব এই জালিমদের প্রাপ্য তাই, যা তাদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। কাজেই তারা যেন আমার কাছে তা তাড়াতাড়ি না চায়। (৬০) অতএব কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রকৃতপক্ষে) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি (এখন আনুষঙ্গিকভাবে ও ইবাদতের পূর্ণতার খাতিরে জিন ও মানব সৃষ্টির ফলে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে কতক জিন ও কতক মানব দ্বারা ইবাদত সংঘটিত না হওয়াও এই বিষয়বস্তুর প্রতিকূলে নয়। কেননা, لِيَعْبُدُونِ

---এর সারমর্ম হচ্ছে তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা ---ইবাদত করতে বাধ্য করা নয়। শুধু জিন ও মানবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে ইচ্ছাধীন ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ইবাদত বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ইবাদত আছে বটে; কিন্তু তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু তথা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির ইবাদত ইচ্ছাধীন নয়। মোট কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত দাবী হল ইবাদত। এছাড়া) আমি তাদের কাছে (সৃষ্ট জীবের) জীবিকা দাবী করি না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ নিজেই সবার রিযিকদাতা (কাজেই সৃষ্ট জীবকে রিযিকদানের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই), শক্তিশালী,

পরাক্রান্ত। (অপারকতা, দুর্বলতা ও অভাব-অনটনের কোন যৌক্তিক সম্ভাবনাও নেই। কাজেই আহার্য চাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং ইবাদতের প্রধান অঙ্গ ঈমান, তখন এরা এখনও শিরক ও কুফরকে আঁকড়ে থাকলে শুনে রাখুক) এই জালিমদের প্রাপ্য শাস্তি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে তাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অতীত) সমমনাদের প্রাপ্য (নির্ধারিত) ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহ্‌র জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধীকে পালাক্রমে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয় ---কখনও ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে এবং কখনও শুধু পরকালে)। অতএব তারা যেন আমার কাছে তা (অর্থাৎ আযাব) তাড়াতাড়ি না চায়, (যেমন এটাই তাদের অভ্যাস। তারা সতর্কবাণী শুনে মিথ্যারোপ করার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি আযাব চাইতে থাকে)। অতএব (যখন পালার দিন আসবে, যার মধ্যে কঠোরতর দিন হচ্ছে প্রতিশ্রুত দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন) কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (খোদ এই সূরাও এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা শুরু হয়েছিল ঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ এবং ইতিও এই প্রতিশ্রুতির উপর করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে সূরার অলংকারগত সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। দুই. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বস্তু শুধু মু'মিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মু'মিন, তারা কমবেশী ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আয়াতের এক কিরা'আত مؤمنين শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ এই কিরা'আত থেকে উপরোক্ত তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জওয়াবে

তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহ্‌র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আল্লাহ্‌প্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ—অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড় লোকই হোক না কেন---কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুযী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذَنُوبًا—শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذ ن و ب শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে! কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

سورة الطور

সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৯ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالطُّوْرِ ۙ (١) وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ (٢) فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ (٣) وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ (٤)
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ (٦) اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ (٧)
مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ (٨) يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ (٩) وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ
سَيْرًا ؕ (١٠) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ (١١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ
يَّلْعَبُوْنَ (١٢) يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ (١٣) هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ
كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ (١٤) اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ (١٥) اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ (١٦) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ (١٧) فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ
رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (١٨) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ (١٩) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ
عِيْنٍ (٢٠) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍ ۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ (٢١)
وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ (٢٢) يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا
لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ (٢٣) وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ

مَكْنُونٍ ۝ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا
كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا
عَذَابَ السَّمُومِ ۝ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) কসম তূর পর্বতের (২) এবং লিখিত কিতাবের (৩) প্রশস্ত পত্রে, (৪) কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের (৫) এবং সমুন্নত ছাদের (৬) এবং উত্তাল সমুদ্রের (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেইদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়। (১৩) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (১৪) এবং বলা হবেঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের-সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবেঃ আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম তূর (পর্বতের), এই সেই কিতাবের, যা উন্মুক্ত পত্রে লিখিত আছে। (অর্থাৎ

আমলনামা, যার সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا

এবং কসম বায়তুল মামূরের (এটা সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতখানা)। এবং কসম সমুন্নত ছাদের (অর্থাৎ আকাশের ; আল্লাহ্ বলেন ঃ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا — আরও বলেন اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ) এবং কসম উত্তাল-সমুদ্রের। (অতঃপর কসমের জওয়াব বলা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা (স্বস্থান থেকে) সরে যাবে। [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকম্পিত হওয়া সাধারণ অর্থেও হতে পারে এবং বিদীর্ণ হওয়ার অর্থেও হতে পারে ; যেমন অন্য আয়াতে আছে فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ রূহুল-মা'আনীতে উভয় তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অগ্রে-পশ্চাতে উভয়টি হতে পারে। এখানে পর্বতমালার সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ অন্য আয়াতে আছে بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً এসব কসমের কারণ একটি উদ্দেশ্যকে চিন্তাধারার নিকটবর্তী করা। উদ্দেশ্য এই ঃ কিয়ামত সংঘটনের আসল কারণ প্রতিদান ও শাস্তি। এটা শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তিতে হবে। অতএব, তূর পর্বতের কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদানের মালিক। এসব বিধান পালন অথবা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে প্রতিদান ও শাস্তি হবে। আমলনামার কসম খাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানাবলী পালন ও প্রত্যাখ্যান সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদান ও শাস্তি এর উপর নির্ভরশীল, যাতে বিধানাবলী প্রতিপালন জরুরী হয়। বায়তুল মামূরের কসমে ইঙ্গিত আছে যে, ইবাদত একটি জরুরী বিষয়। এমনকি, যে ফেরেশতাদের প্রতিদান ও শাস্তি নেই, তাদেরকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অতঃপর জান্নাত ও দোযখ এই দুটি বস্তু হচ্ছে প্রতিদান ও শাস্তির পরিণতি। আকাশের কসমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাত আকাশের মতই সমুন্নত বস্তু। উত্তাল সমুদ্রের কসমে ইশারা রয়েছে যে, দোযখও উত্তাল সমুদ্রের অনুরূপ ভয়াবহ বস্তু। এরপর কিয়ামতের কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী তখন] যারা (কিয়ামত, তওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সত্য বিষয়ে) মিথ্যা-রোপ করে (এবং) যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছামিছি কথা বানায়, (ফলে শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়)

সেদিন তাদের খুবই দুর্ভোগ হবে ; যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। (কেননা, এরূপ জায়গার দিকে কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে না। অতঃপর নিক্ষেপের সময় فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ—অর্থাৎ মাথায় ও পায়ে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে দোযখ দেখিয়ে শাসিয়ে বলা হবে ঃ) এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে (অর্থাৎ এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতে) এবং যাদু আখ্যা দিতে। আয়াতগুলো তো তোমাদের মতে যাদু ছিলই। এখন এটা (-ও) কি যাদু, (দেখে বল) না (এখনও) তোমরা চোখে দেখছ না? (যেমন দুনিয়াতে চোখে না দেখার কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলে)। এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। (তোমাদের হা-হুতাশের কারণে মুক্তি দান করা হবে না এবং মেনে নেওয়ার ফলেও দয়া করে দোযখ থেকে বের করা হবে না ; বরং অনন্তকাল এতে থাকতে হবে)। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (তোমরা কুফর করতে, যা সর্ববৃহৎ অবাধ্যতা এবং আল্লাহ্‌র হক ও অসীম গুণাবলীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। সুতরাং প্রতিফলস্বরূপ অনন্তকাল দোযখ ভোগ করবে। অতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে (ভোগবিলাস) দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (এবং জান্নাতে দাখিল করে বলবেন ঃ) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ খুব তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (এটা হবে সাধারণ মু'মিনদের অবস্থা। অতঃপর সেই মু'মিনদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের গুণে গুণান্বিত। বলা হচ্ছে ঃ) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানে তাদের অনুগামী (অর্থাৎ তারাও ঈমানদার যদিও তারা আমলে পিতাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি। আমলের কথা উল্লেখ না করায় তা বোঝা যায়। এছাড়া হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, বলা হয়েছে ঃ كانوا دونه فى العمل وكانت منازل ابائهم ارفع ولم يبلغوا درجتك وعملك এমতাবস্থায় আমলে ত্রুটি থাকার কারণে তাদের মর্তবা কম হবে না বরং মু'মিন পিতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য) আমি সন্তানদেরকেও (মর্তবায়) তাদের সাথে মিলিত করে দেব। (মিলিত করার জন্য) আমি তাদের (অর্থাৎ জান্নাতী পিতাদের) আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না (অর্থাৎ পিতাদের কিছু আমল হ্রাস করে সন্তানদেরকে দিয়ে সমান করা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তির কাছে ছয়শ টাকা এবং এক ব্যক্তির কাছে চারশ টাকা আছে। উভয়কে সমান করার উদ্দেশ্য হলে এক উপায় হল এই যে, ছয়শ টাকা ওয়ালার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে চারশ ওয়ালাকে দেওয়া। ফলে উভয়ের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উপায় এই যে ছয়শ ওয়ালার কাছ থেকে কিছুই না নেওয়া ; বরং চারশ ওয়ালাকে নিজের কাছ থেকে দু'শ টাকা দিয়ে দেওয়া

এবং উঁভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা দাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে প্রথম উপায় অবলম্বিত হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কম হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নামিয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না ; বরং দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্তরেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে ঈমানের শর্ত না থাকলে তারা মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কেননা, কাফিরদের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ (কুফরী) কৃতকর্মের জন্য দায়ী।(بقوله تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ অর্থাৎ মুক্তির কোন উপায় নেই। ফলে তাদের মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই মিলিত হওয়ার জন্য সন্তানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অতঃপর পুনরায় ঈমানদার ও জান্নাতীদের কথা বলা হচ্ছে ঃ) আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা (আনন্দ-উল্লাসের ভঙ্গিতে) একে অপরকে পানপাত্র দেবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) অসার বকাবকি নেই, (কেননা তা নেশাযুক্ত হবে না) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (ফলমূল আনার জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে (এই কিশোর কারা ? সূরা ওয়াকিয়ায় তা বর্ণনা করা হবে)। যারা (বিশেষভাবে) তাদেরই সেবায় নিয়োজিত থাকবে (এবং এমন সুশ্রী হবে) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। (যা অত্যন্ত চমকদার ও ধূলাবালু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যাত্মিক আনন্দও লাভ করবে। তন্মধ্যে এক এই যে,) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (এবং একথাও) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে (অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিণাম সম্পর্কে) ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তাঁর কাছে দোয়া করতাম (যে, আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করুন। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন)। তিনি বাস্তবিকই অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু। (এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالطُّورِ—হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি। ---(কুরতুবী) তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ—رق শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য

কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ—আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মামূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মিরাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মামূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।--(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। ---(ইবনে কাসীর)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ—مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ---(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করল ঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।---(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ مسجور-এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ—আপনার পালনকর্তার আযাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।---(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতএম (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।---(কুরতুবী)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا—অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مور বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবেঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়।---(মাযহারী)

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা)-রই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবেঃ পরওয়ারদিগার, দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবেঃ তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। ---(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেনঃ এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবেঃ পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবেঃ তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ—أَلَتْ ও أَلَاتٌ-এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।---(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এইঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে পিতাদের সমান করে দেবেন।

كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎ কর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।---(ইবনে কাসীর)

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم
مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ
طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ
مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾
أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ
رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ
تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٣٢﴾
أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِنْ يَرَوْا
كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٣٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ
يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ
ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٣٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٣٩﴾

(২৯) অতএব আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে ঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্র সন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপে বসেছে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাফির, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে ঃ এটা তো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে,

কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। (৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আপনার প্রতি প্রচারযোগ্য বিষয়বস্তু সম্বলিত ওহী নাযিল করা হয়; (যেমন উপরে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিষয়বস্তুর সাহায্যে মানুষকে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন (যেমন মুশরিকদের এ উক্তি সূরা ওয়ায-যোহার শানে নুযূলে বর্ণিত আছে قد ترك شيطانك-এর সারমর্ম এই যে, আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয়বাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এক আয়াতে আছেঃ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ—এখানে বলা হয়েছে যে, আপনি উন্মাদ নন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা---মানুষ যাই বলুক)। তাঁরা কি (অতীন্দ্রিয়বাদী ও উন্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায়ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি (দুররে মনসূরে আছে, কোরাইশরা পরামর্শগৃহে একত্রিত হয়ে প্রস্তাব পাস করল যে, মুহাম্মদও একজন কবি। অন্যান্য কবি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে খতম হয়ে গেছে, সেও তেমনি খতম হয়ে যাবে এবং ইসলামের ঝগড়া মিটে যাবে)। আপনি বলে দিনঃ (ভাল কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অশুভ ও ব্যর্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা মরবে, আমি মরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ধর্ম অচল হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তারা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়, না তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক? (তারা নিজেদেরকে প্রগাঢ় বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী বলে দাবী করে, যেমন সূরা আহ্কাফে বর্ণিত তাদের উক্তি থেকে বোঝা যায় لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ। মায়ালেম কিতাবেও বর্ণিত আছে যে, কোরাইশ সরদারগণ মানুষের মধ্যে অত্যধিক বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের বুদ্ধির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধি সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিক্ষা দিত না। এটা বুদ্ধির শিক্ষা না হলে নিছক দুষ্টুমি